দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ কারণ ও পরিণাম- একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় অধ্যায়

পঞ্চাশের মন্বন্তর : কারণ ও পরিণাম একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

'মন্বন্তর' এবং 'দুর্ভিক্ষ' দুটি শব্দই সমার্থক। ড· বিনতা রায়চৌধুরী বলেছেন -

> "'মন্বন্তর' শব্দটি কয়েকটি অর্থ বহন করে। যেমন মনুর শাসন কাল, বন্যা, বিপ্লব, প্রলয়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু প্রচলিত অর্থে 'মন্বন্তর' বলতে দুর্ভিক্ষকে বোঝায়।" [১]

অভিধানে দুর্ভিক্ষ শব্দের উৎপত্তি দেখানো হয়েছে এভাবে -

> "১। দুর্ভিক্ষ - দুর্ভিক্ষ্য দুর (অভাব) + ভয়, ভক্ষ্য (ভক্ষ-ভোজন করা। + অ, ষ = ভক্ষ্য দ্রব্য, অব্যয়ী- বি, খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষ।
> ২। দুর(দুঃখে)ভক্ষ = ভক্ষ্য (ভক্ষণীয়) বিণ, কষ্টে ভক্ষ্যণীয়" [২]

এছাড়া বাংলা ব্যাকরণে দেখা যায় বৈয়াকরণিকরা সমাসে দুর্ভিক্ষ শব্দের ব্যাস বাক্য করেন ভিক্ষার অভাব (অব্যয়ীভাব সমাস)। বাংলা 'মন্বন্তর' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহার হয় Famine শব্দটি। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় Famine শব্দের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় -

> "An extreme and protracted shortage of food usually resulting in higher than normal death rates." [৩]

'ভারতকোষ'এ দুর্ভিক্ষ শব্দের বিস্তারিত পরিচিতি রয়েছে এভাবে -

> সাধারণতঃ বহুস্থানে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়। ... ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা অনেকটা মৌসুমী বায়ুর মর্জির উপরে নির্ভরশীল বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রবণতা চলিয়া আসিতেছে। বেদ, ব্রাহ্মণ ও পুরাণে যজ্ঞের সাহায্যে সুবৃষ্টি ঘটাইয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক যুগে দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও আর্তত্রাণ রাজধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ঐতিহাসিক

> কালে মৌর্যসাম্রাজ্যের সময় হইতেই উত্তম বৎসরে শস্য সংকয় করিয়া দুর্বৎসরের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ে এবং মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা শুনা যায়। ... মুসলমান যুগে যুদ্ধ বিগ্রহের বাহুল্যের ফলে এই জাতীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হয়, যদিও মহম্মদ বিন তোগলক, শেরশাহ এবং আকবর এই ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনের বহুবিধ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রসারের সময়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী নৈরাজ্যের যুগে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চরম হইয়া উঠে।" [৪]

ভারতবর্ষের কিছু কিছু মন্বন্তর প্রকৃতির সৃষ্টি হলেও বেশীর ভাগ মন্বন্তর মানুষের সৃষ্টি ছিল। পৃথিবীর যাবতীয় মন্বন্তরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রকৃতির সৃষ্টি (২) মানুষের সৃষ্টি (৩) প্রকৃতি-মানুষের মিলিত সৃষ্টি (প্রকৃতির দুর্বলতার মানুষ সুযোগ গ্রহণ করে যে 'মন্বন্তর সৃষ্টি' করে তা)বেশীর ভাগ প্রকৃতির সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, পোকার আক্রমণ এবং মহামারী। আর মনুষ্য সৃষ্ট হচ্ছে যুদ্ধ, মজুতদারী, খাদ্যের আমদানী-রপ্তানির ভারসাম্য হীনতা, অর্থনৈতিক অসম বণ্টন ব্যবস্থা, সামাজিক শোষণ, রাজনৈতিক কোন্দল ইত্যাদি।

প্রকৃতি সৃষ্ট খরা, বন্যা, মহামারী থাকবে, আমাদের উৎপাদন যদি চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত করা যায়, তবে কিছু খাদ্য আমরা মজুত রাখতে সক্ষম হব আকাল, বা প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দরকার, শস্যকে তথা কৃষি ব্যবস্থাকে লাভজনক বিনোয়োগে পরিণত করা। অনেক সময় পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, উৎপাদন কম হওয়ার পিছনে খরার চেয়ে বড় হতে পারে অর্থনৈতিক কারণ, যেমন যদি কৃষির উৎপাদন খরচের (সার, বীজ, সেচ, বিনোয়োগের সুদ, খাজনা, শ্রম সব মিলিয়েই উৎপাদন খরচ) চেয়ে ফসলের বিক্রয় মূল্য বেশী না থাকে তবে উৎপাদক

নিরুৎসাহিত হবে এবং পেশা থেকে সরে যাবে কিংবা দায়সারা উৎপাদন করবে। বিক্রয় মূল্যের পাশাপাশি দরকার সহজ বিপনন ব্যবস্থা। কৃষির মূল উৎপাদক এ উপমহাদেশে বেশীর ভাগই ছোট বা কম পুঁজির কৃষক, (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার খামার বাড়ির মালিকের মতো বড় বিনিয়োগকারী কম) এ কৃষক বিপনন সম্পর্কে সুকৌশলী নন, ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের লাভের অংশ তারা যত না পায়, তার চেয়ে বেশী যায় দালাল, আড়তদার, পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ীর হাতে। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন সময় দেখা যায়, কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে উৎপাদন মূল্য কিংবা নামমাত্র মূল্যও না পেয়ে বাজারে বা নদীতে ফেলে দিতে। এই ফেলে দেয়ার পিছনে হয়তো একটা ক্ষোভ আছে, কিন্তু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না এ কৃষক পরবর্তী সালে ঐ ফসল কোন যুক্তিতে উৎপাদন করবে। বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের মূল কারণগুলিকে বাদ দিয়ে বাংলার অসামরিক সরবরাহ সচিব এ মন্বন্তরের বারটি কারণ দেখিয়েছেন। কারণগুলি হচ্ছে -

" ১। ১৯৪২ অব্দে আউস ফসল ভাল হয় নাই।

২। ১৯৪২-৪৩ অব্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে।

৩। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় উৎপাদন কম হইয়াছে।

৪। কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে।

৫। সরকারের নৌকা নিয়ন্ত্রণের নীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

৬। সমুদ্রকূল হইতে লোক অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ব্রহ্ম ও আরকান হইতে আগত আশ্রয়াথীরা ভিড় জমাইয়াছে।

৮। শিল্প কেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িয়াছে।

৯। ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হওয়ার ঘাটতি পূরণের উপায় হয় নাই।

১০। অনেক বিমান ঘাটি তৈয়ারী হওয়ায় সেই জায়গায় চাষ হইতে পারে নাই।

১১। সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার বেশী খরচ হইয়াছে।

১২। অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে।" [৫]

এই বারটি কারণের মধ্যে প্রথম চারটি কারণ এ দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করে। মূলত এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য প্রকৃতি সৃষ্ট এই চারটি কারণের উপস্থিতি বা ভূমিকা ছিল নগণ্য। অথচ এ স্থলে আমার দরকার ছিল - সে চারটি কারণ যে কারণগুলি ছিল মানুষের সৃষ্টি। এ কারণগুলি হচ্ছে - (১) মজুতদারী (২) ঘাটতি অঞ্চল থেকে খাদ্য রপ্তানী বা উঠিয়ে নেয়া (৩) মুদ্রাস্ফীতি (৪) ঔপনিবেশিক শাসকের দিনের পর দিন অর্থনৈতিক শোষণ। এই কারণগুলি মানুষের দিকে তথা নিজেদের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেই সরবরাহ সচিব প্রকৃতি সৃষ্ট কিছু গৌণ কারণকে মুখ্য কারণ দেখিয়ে 'বোবা' প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইলেন, নিজেদের দোষ হাল্কা করার অভিপ্রায়ে। সব চেয়ে আশ্চর্য মজুতদারী এবং খাদ্য রপ্তানী নামক প্রধান দুটি কারণের উল্লেখ নেই এই বারটি কারণে। কিন্তু ইতিহাস চিরকালের জন্য সরবরাহ সচিব বা শাসকদের ক্রয় করা বস্তু নয়, এটা সাময়িক কারো আয়ত্বাধীন থাকতে পারে। সময়ে এটার মুক্তিলাভ ঘটে। ফলে আমরা পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্য কারণ পাই। নিম্নে তার বর্ণনা দেয়া হল।

কোন একটি নির্দিষ্ট কারণের পরিনাম যদিও পঞ্চাশের মন্বন্তর নয় তবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, মজুতদারি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ব্যবসা, খাদ্য রপ্তানী, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতাদের অমানবিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন অপকান্ডের ফলে একটি ভূখন্ড ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হলেও মূল কারণ ছিল যুদ্ধ। বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ সব গুলি উপরোক্ত কারণই মানুষের সৃষ্টি। কোন একদিনে ভূমিকম্পের মতো দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে নেমে আসেনি। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য মানুষ সময় হাতে পেয়েছে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে কেউ কিছু করেনি একথা বললেও ভুল হবে। তবু সংগঠিত হয়েছে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষের ট্রাজেডি এখানে, মানুষের প্রতিপক্ষে ছিল মানুষ। প্রায় গবেষক স্বীকার করেছে, প্রকৃতি যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী মানুষ।

এই দুর্ভিক্ষের পক্ষে বিপক্ষে দুটি গোষ্ঠির মধ্যে দুর্ভিক্ষের পক্ষের গোষ্ঠীটি ছিল ঔপনিবেশিক শাসক এবং তাদের বরপুষ্ট দালাল, জমিদার এবং মজুতদাররা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের মূলে ছোট বড় অনেক গুলি কারণ। তার মধ্যে প্রধান কারণ সমূহ হচ্ছে (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (৩) রেলপথ নির্মাণ (৪) সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস (৫) রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দল (৬) সরকারী শোষণ ব্যবস্থা (৭) সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মিলিত মজুতদারী ব্যবসা (৮) মেদিনীপুরের বন্যাজনিত ক্ষতি (৯) পোড়ামাটি নীতি (১০) মুদ্রাস্ফীতি (১১) বিশেষ অঞ্চল বা মানুষের প্রতি সরকারের তোষণ নীতি (১২) 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য স্থায়ী উৎপাদন ঘাটতি অপেক্ষা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক এ উপমহাদেশে তাদের শোষণ ব্যবস্থা এবং ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অব্যাহত শস্য রপ্তানীই দায়ী। অনুরাধা রায় লিখেছেন -

> "১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় চালের উৎপাদন কম হয়েছিল বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হবার মতো কম নয়। বৃহৎ বঙ্গে (বাংলা বিহার উড়িষ্যা) চালের উৎপাদন এবং পাঞ্জাবে গমের উৎপাদন আগের বছরগুলির তুলনায় বেশিই হয়েছিল। তবু বাঙালীর খাদ্যে ঘাটতি পড়ল। কারণ বহু বছর ধরেই বাংলার নিজস্ব চালে তা কুলাতো না, বাইরে থেকে আমদানী করা চালের ওপর নির্ভর করতে হত, বিশেষ করে বর্মার চাল। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীদের হাতে বর্মার পতন ঘটলে সেখান থেকে চাল আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। আমদানী বন্ধ হল বটে, কিন্তু রপ্তানী করতে হল প্রচুর চাল।" [৬]

তসলিমা নাসরিন দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষের মৌলিক কারণগুলি, একদিকে যেখানে খাদ্যে আমদানী করা দরকার সেখানে রপ্তানী হচ্ছে। অন্যদিকে যুদ্ধের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, মানুষের জীবন নিয়ে প্রহসন, সামগ্রিক মিলিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তর -

> "তবে আকালের পেছনে অন্য কারণও ছিল।... পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্মানি নাৎসি বাহিনী যেমন বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল এক একটি দেশের উপর দিয়ে, পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানি ফৌজও তেমনি এগিয়ে আসছিল

ঝড়ের বেগে। রেঙ্গুনের পতন ১৯৪২ সালের ১০ মার্চ। সুতরাং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ। ঘাটতি আরও সে কারণেই। ... তাছাড়া গম আমদানী করা হয়েছে বছরের দ্বিতীয় ভাগে, গোড়া থেকে নয়। বিয়াল্লিশ সালে যা আমদানি করা হয়েছিল, সিংহল প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। সৈন্যদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল মজুত ভাণ্ডার। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে মানুষের ক্ষমতা ছিল না কিনে খাবার। কারণ খাদ্যশস্যের বিশেষ করে চালের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে চালের পাইকারি দর ছিল মণ প্রতি ১৩ টাকা ১৪ টাকা। ১৯৪৩ এর মার্চে তা দাঁড়ায় ২১ টাকা, মে মাসে ৩০ টাকা আগস্ট মাসে ৩৭ টাকা এবং বেসরকারি মতে আরও বেশি। চট্টগ্রামে অক্টোবরে চালের দাম পৌঁছায় ৮০ টাকা মণ। ঢাকায় ১০৫ টাকায়। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরে বাংলায় চালের মণ প্রতি দর ছিল ৭ টাকা থেকে ৭ টাকা চার আনা। বিয়াল্লিশের জুলাইয়ে ৭ টাকা বারো আনা থেকে ৮ টাকা। ডিসেম্বরে ১৩ টাকা থেকে ১৪ টাকা। অথচ পরের বছর অক্টোবরেই কিনা ১০৫ টাকা।... ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়কের ফলে অনেক ভূমিহীন শ্রমিক বেকার। দুর্ভিক্ষে না খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়েছিল এই ভূমিহীন শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, জেলেরা এবং যারা ধান ভেঙে পেট চালাতেন তারা। কলকাতার পথে প্রধানত তাঁরাই কঙ্কালে লিখে রেখে গিয়েছিলেন সেদিন মানুষের উদাসীনতা আর হৃদয়হীনতার এক কলঙ্ক কাহিনী। সব যানবাহন তখন যুদ্ধ কবলিত। জাপানিরা পূর্ব বঙ্গে হামলা দিচ্ছে শোনা মাত্র সেখানকার চারটি জেলা থেকে ধান চাল সরিয়ে নেওয়া হয়। নৌকা দখল করা হয়। কয়েক হাজার নৌকা ভেঙে ফেলা হয়। সৈন্যদের জন্য কিছু রেখে ডুবিয়ে দেয়া হয় বেশ কিছু। একদিকে এসব বিভ্রাট, অন্যদিকে মজুত উদ্ধার এবং খাদ্য সরবরাহ নিয়ে প্রহসন।" [৭]

বাংলায় চালের আমদানী রপ্তানীর একটি চিত্র থেকে সরকারের প্রহসনের চিত্রটি স্পষ্ট হবে -

"১৯৪১ সালে আমদানী হয়েছিল ৪, ৩২, ০০০ টন, রপ্তানি হয়েছিল ১, ৩৬, ০০০ টন। ১৯৪২ সালে আমদানি হয় মাত্র' ১, ৩৫, ০০০ টন, কিন্তু সিংহল প্রভৃতি কয়েকটি দেশে ৩, ২০, ০০০ টন চাল রপ্তানি করা হয়, কারণ ব্রহ্মদেশে জাপানের আক্রমণের ফলে ... ব্রহ্মদেশ থেকে চাল আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।" [৮]

তবুও বলা যায় খাদ্য ঘাটতি পঞ্চাশের মন্বন্তরের একমাত্র কারণ নয়। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন -

"সরবরাহের দিক থেকে কোন মারাত্মক ঘাটতির ফলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়নি।" [৯]

তাহলে কারণটি কি ? অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন একটি কারণ হচ্ছে Exchange Entitlement (একজন মানুষ সমাজকে সেবা বা শ্রম দিয়ে তার বিনিময়ে যে পরিমান সেবা বা দ্রব্য পাওয়ার অধিকার রাখে, সেটা হল তার Exchange Entitlement)। যুদ্ধের কারণে কিছু লোকের ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে যায়, আর কিছু লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি মানে বাকিদের কমে যাওয়া। কিন্তু অনেকে পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের এ তত্ত্বটি (Exchange Entitlement) নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অনুরাধা রায় মন্তব্য করেছেন -

"অমর্ত্য সেনের যুক্তিবিন্যাসে ফাঁক কম। কিন্তু যে দুর্ভিক্ষকে আমরা বরাবর মনুষ্য সৃষ্ট বলে জানতাম, অর্থনীতির তত্ত্বের মারপ্যাঁচে সেই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মানুষগুলির দায়িত্ব তিনি অনেক লঘু করে দিয়েছেন। সরকারকে অল্পেই রেহাই দিয়েছেন। কালোবাজারী মজুতদারদের কথাও বেশী বলেননি। অংকভিত্তিক অর্থনীতির তত্ত্ব আর যাই প্রমাণ করুক, অমানবিক বঞ্চনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে ধরতে পারে না। Exchange entitlement এ যে বিপর্যয়ের কথা সেন বলেছেন, তার মূল কারণ তো শাসক ও শোষকের অমানবিকতা। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসক আরো বেশি অসংবেদী হয়। এটা ধরা পড়েনি সেনের লেখায়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও কি তাঁর তত্ত্ব দুর্ভিক্ষকে পুরোপুরি ধরতে পারে ? যাদের Exchange entitlement বাড়ল তারা কি এতটা বেশি পরিমাণেই চাল কিনে ফেল যে অন্যদের জন্য কিছু রইল না ? যে Supply ও demand-এর কথা সেন বলেছেন, কোন্ বাজার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে সে কথা ? সেটি কি একটা মুক্ত বাজার ? সেখানে কি র‍্যাশন ব্যবস্থা কোথাও চালু ছিল না ? তা তো নয়। র‍্যাশন চালু ছিল শুধু কলকাতায়, অন্যত্র নয়। আর ১৯৪৩-এর একটা সময় জুড়ে চালের বাজার বলে কিছু ছিলই না বাংলাদেশে। যেটা ছিল সেটা কোনো বাজার নয়, একটা racketeering-এর প্রক্রিয়া। সরকার ও কালোবাজারী মজুতদাররা মিলে বাজার ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিশেষ করে বাংলার লাট হার্বার্ট যখন কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হককে সরিয়ে মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দীনকে দিয়ে সরকার গঠন করালেন, তারপর থেকে সরকারের চাল সংগ্রহের এজেন্ট ইস্পাহানীর যথেচ্ছাচারিতার সীমা পরিসীমা রইল না এবং প্রক্রিয়াটির তলার দিকে ছিল আরো অসংখ্য কালোবাজারী শস্য ব্যবসায়ী।" [১০]

মূলতঃ পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য দায়ী করা যায় মজুতদারী, যুদ্ধে হুঁস হারা সরকারের দুর্বল কন্টন ব্যবস্থা এবং দরিদ্র মানুষের প্রতি আন্তরিকহীনতাকে। বস্তুতঃ বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ঔপনিবেশ গড়ে তুলতো সম্পদ আহরণের অভিপ্রায়ে। ঔপনিবেশিক আমলে তাদের সৎ শাসন অপেক্ষা অসৎ শোষণ হতো অনেক বেশী। পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখা যায় চালের দর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, হঠাৎ যুদ্ধপূর্ব স্তরের দশ গুণের উপরে পৌঁছায়। চালের মূল্য বৃদ্ধি হয় লাফিয়ে লাফিয়ে।

"১৯৪৩ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে চালের দাম দ্রুত বাড়তে লাগলো। কংগ্রেস সদস্য নলিনাক্ষ সান্যাল বিধান সভায় চব্বিশ পরগণা জেলার বসির হাটের চালের দামের এই রকম হিসাব দিয়েছিলেন : ২ জানুয়ারী ৮ টাকা ১২ আনা, ২০ ফেব্রুয়ারী ৮ টাকা ১২ আনা, ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৩ টাকা, ১০ মার্চ ২১ টাকা।" [১১]

আর দর বৃদ্ধির প্রথম বলি গ্রামের কৃষকসহ সমাজের দরিদ্র মানুষ। কৃষকের ব্যাপক দারিদ্র ছিল মহাজনদের নিকট থেকে ঋণগ্রহণ এবং একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমি-জমা মহাজন এবং জমিদারদের হাতে যাওয়ার পথটি। সম্বল কৃষক এতোদিন যে জমি আঁকড়ে ছিল, আজ তা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। অনেক গবেষকের দৃষ্টি সেখানে নয়। তার বদলে কখনো কখনো অন্য রকম, যা দুর্ভিক্ষের দায়-দায়িত্ব এলোমেলো করে দেয় কিংবা সে অসহায় মানুষগুলির পাল্টা দোষ খোঁজা। কারো ব্যাখ্যায় বাস্তব অনেক বিষয় আবার এলোমেলো হয়ে পড়ে। যেমন মার্কিন গবেষক পল গ্রীনো। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে গ্রীনো একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কাজটি প্রশংসনীয় কিন্তু -

"গ্রীনো স্পষ্টত দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার্থে উপনিবেশের উপর প্রচন্ড অন্যায় করেছে যে ব্রিটিশ সরকার, বিকৃত লোভের বশে গুদামে অকল্পনীয় পরিমানে চাল বোঝাই করেছে যে শহুরে মজুতদার, গোলা থেকে বস্তা বস্তা চাল সরিয়ে বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে যে খরী কৃষক এবং রাত্রির অন্ধকারে সেই চাল অন্যত্র পাচার করছে অধিকতর মুনাফার লোভে: এদের কোনো তুলনা হয় সেই অল্প সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকের যে তার শেষ সম্বল ২-৩ মণ ধান প্রতিবেশীকে না দিয়ে নিজেই পরিবারের জন্য রাখতে চেয়েছে, যা সেই পুরুষের যে পরিবারের খাদ্য সংস্থান করতে না পেরে তার স্ত্রীপুত্রকে ছেড়ে চলে গেছে, বা সেই পিতার যে চরম অবস্থায় তার কন্যাকে বিক্রয় করেছে? অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক - কোনো তুলনাই বোধ হয় খাটে না এখানে। এ বড়ো আশ্চর্য যে গ্রীনো এই দুর্ভিক্ষের প্রধান ভূমিকায় রেখেছেন বাঙালির মূল্যবোধকে। আর তাঁর কাছে মজুতদার কালোবাজারী বাঙালি এবং নিম্ন কৃষি শ্রমিক বাঙালি এক। এবং নেপথ্য অভিনেতা ব্রিটিশ সরকারও বাংলায় থেকে থেকে বাঙালি হয়ে গেছে, এটাই বোধ হয় বলতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, বিপদের সময় স্বার্থ রক্ষার্থে 'অন্নদাতা' কর্তৃক 'পোষ্য'দের পরিত্যাগই হল বাঙালির নীতিশাস্ত্র ও সাংস্কৃতিক নিয়ম। এটাই হল

তার ধর্ম, যাকে বলে আপদ্‌ধর্ম। আলোচ্য সময়টাতে সরকারও এই আপদ্‌ ধর্মই পালন করেছে, গ্রামের ধনী কৃষকও তাই করেছে, গৃহে পিতাও অই করেছে। এই ভাবে দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণ এক করে দিয়ে গ্রীনো জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন।"[১২]

তাই অনুরাধা রায় অনুযোগ করে বলেন -

> "একজন আধুনিক গবেষক, তিনি যদি পরিশ্রম লব্ধ তথ্য দিয়ে বই লেখেন এবং বিশেষত তিনি যদি হন সাহেব, তবে তাঁর এসব কথা আমাদের শুনতেই হয়। তবে অন্তত বাঙালি সংস্কৃতি বোঝার ব্যাপারে স্বদেশের শিল্প সাহিত্যিকদের ওপর নির্ভর করা-টাই বোধ হয় শ্রেয়। এরা কিন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ ও লক্ষণের মধ্যে তফাতটা ভালো করেই বুঝেছিলেন।"[১৩]

গ্রীনো সকল বাঙালীকে এক করে দেখেছেন, কিন্তু এখানে দুটো শ্রেণী ছিল, একটা সাধারণ জনগণ, অন্যটা মহাজন-জমিদার, মজুতদার শ্রেণী। এই মহাজন, জমিদার এবং বুর্জোয়া ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের হর্তাকর্তাদের মদদপুষ্ট, মন্বন্তরের যারা ছিল সক্রিয় সহযোগী। বাজার থেকে শস্য আহরণ, সৈনিকের জন্য খাদ্য মজুত, শস্য রপ্তানী, ইত্যাদিতে অর্থলোভে সহযোগিতা করেছে এরা। মজুতদার চক্র গোষ্ঠির কল্যাণে শস্যের দর বৃদ্ধির ইঙ্গিতও আগাম পেয়ে যাচ্ছে আর মজুতদাররা চক্রবদ্ধ বলে, শস্যের দর বৃদ্ধির খবর তাদের মাঝে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণে যারা প্রাণ হারায়, তারা ছাড়া যারা বেঁচে-ছিল খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের দর বৃদ্ধির ফলে তাদের অনেকে পরে ক্রমানুয়ে নিঃস্ব হতে থাকে। আবু ইসহাক 'সূর্য দীঘলবাড়ী' উপন্যাসে বলেছেন তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের ভূত সিন্দবাদের ঘাড়ে চেপে বসা ভূতের মতো বাঙালীর ঘাড়ে চেপে বসল। পরবর্তীকালে দেখা যায় নিম্নবিত্তের সিংহভাগ অংশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শ্রেণী সংঘাত বৃদ্ধি পায়। ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের সমর্থন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং বৃটিশ শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে সামন্ত ভূস্বামী, রাজনীতিবর্গ, মুৎসুদ্দী, বুর্জোয়া, অর্থলোভী, সুবিধাবাদী ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের কোন সমর্থক ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পঞ্চাশের একটা কারণ। B.M.Bhatia লিখেছেন -

> "From 1910 to 1940 there were 18 scarcities, but there was no loss of life due to starvation over the entire period." [১৪]

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলেই ভারতবর্ষে সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। এর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ১৮৯৫-৯৭এর মন্বন্তর ছাড়া অন্য মন্বন্তরগুলি এতোটা প্রকোপ বিস্তার করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির মধ্যে ব্রিটিশরা হিমসিম খেয়েছে বেশি। এ হিমসিম একদিকে ইউরোপে ব্রিটিশের খোদ রাষ্ট্র ইংল্যান্ড। অপর দিকে বিশ্বে তাদের ছড়ানো-ছিটানো উপনিবেশ গুলোকে নিয়ে। কারণ উপনিবেশগুলো এর আগেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে। কেউ কেউ মন্বন্তরের জন্য খাদ্য পরিবহন সমস্যাকে এ মন্বন্তরের কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা অবশ্যই একটা সংকটে পড়েছে। কিন্তু সে সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য সরকার বাহাদুরও উদাসীন ছিল। যদি ব্রিটিশের সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষ থেকে খাদ্য রফতানি বা মজুত না হতো, তবে বাজারে এতো তাড়াতাড়ি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হতো না। মুনাফার জন্য বিশ্বের পরাশক্তিরা যেমন যুদ্ধ বাধিয়েছে, তেমনি মুনাফার জন্য ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যবাদীরা খাদ্যকে মজুত করে কৃত্রিম সংকটকে প্রকট করে তুলেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় খাদ্য মিলেছে তবে তা ছিল সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে তাই মন্বন্তরের বলি হয়েছে দরিদ্র জ গোষ্ঠিরা, নিম্নবিত্ত ও মধ্য বিত্তরা। উচ্চবিত্তরা এর বলি হতে হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করলে ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষে চাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মদেশের চাল দিয়ে যেখানে বাংলায় খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা হতো সেখানে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ দখল করলে বাংলার খাদ্য সংকট নিয়ে ব্রিটিশের ভাবার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। পরিস্থিতি ভয়াবহ হলে অন্যান্য প্রদেশকে বাংলায় খাদ্য সরবরাহের যে অনুরোধ তারা করেছিল মুনাফার লোভে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীরা তার বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এক দিকে খাদ্যের জোগান কম, অপর দিকে মজুতদারি - এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের আয়ে বাধা। যুদ্ধের ফলে কৃষি, শিল্প, সব বৃহৎ মজুরির চাহিদার প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বিঘ্নিত হয়ে সাধারণ মানুষের আয়ের পথ সংকুচিত হয়ে আসে। ব্যবসায়ীরা সৃষ্ট

সংকটকে মজুতদারীর মাধ্যমে আরো চুঙ্গে তুলে দেয়। সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে সাধারণ মানুষের। উপার্জন হয় বন্ধ। দেশব্যাপী যুদ্ধ। চাকরি বন্ধ, ভিক্ষার অভাব, ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া মানুষের আর কোন পথই খোলা থাকে না। মানুষের সর্বশেষ সম্পদ আপন জন কিংবা দেহ বিক্রি করেও পরাজিত হয় মানুষ বেঁচে থাকার যুদ্ধে। আভিজাত্য, বর্ণবাদ, সতীত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, আত্মদান, দয়া, সব কর্পূরের মতো উবে যায়। সব মূল্যবোধ ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। বেঁচে থাকে শুধু উগ্র স্বার্থবোধ। দশকোটি মানুষের এলাকায় দুর্ভিক্ষে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের পরীক্ষণ (Expriment) যেন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দিয়ে প্রকৃতি জনসংখ্যা কমিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চাইছে। ম্যালথাস বলেন, জনসংখ্যা যখন খাদ্য উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় তখন দেখা দেয় নানাবিধ প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগ (মানুষের সৃষ্টি ?)। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদি দিয়ে প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে ভারসাম্য ভেঙ্গে দিয়েছে মানবতার - বাবা মেয়েকে বিক্রি করে কয়েক বেলার আহার জুগিয়েছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের আর একটি কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রবার্ট ক্লাইভের প্রবর্তন করা বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যর্থ হয়ে গেলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি নিজ হাতে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা নিয়ে নেয়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হিস্টিংস বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। এ সময় রাজস্ব দপ্তর মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের এক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেখানে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষা হবে। হেস্টিংস সেই নতুন নীতি গ্রহণ করেন কোম্পানী ও জমিদারদের স্বার্থের কথা ভেবে ফলে জমিদারদের নিকট পাঁচ বছরের জন্য জমি ইজারা দেন। কিন্তু এতে সুফল না পাওয়ায় পাঁচ বছরের পরিবর্তে এক বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা নেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নতুন গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তিনি হেস্টিংসের পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতিতে জমিদারদের জমি ইজারা দেন। তিনি ১৭৯০ সালে দশসালা বন্দোবস্ত (১০ বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেয়া) চালু করেন। পরে ১৭৯৩ সালে তিনি দশ সালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। বৃটিশের এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কয়জন গভর্ণর বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল এঁটেছেন কর্ণওয়ালিস তাদের অন্যতম। কর্ণ ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের কৃষক শ্রেণী দৈনন্দিন পঙ্গু হয়ে পড়ে। অপর দিকে লাভবান হয় জমিদার এবং ইংরেজ তোষামদকারী শ্রেণী। জমিদাররা এতে শোষণের সুযোগ পায়। তৎকালীন জমিদারের চরিত্র দেখাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন -

"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ... জমিদার নায়ক বড় মানুষ, কৃষক নায়ক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমিদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে। কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়-শোণিত পান করা দয়ার কাজ"। [১৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগে বাংলার যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল তাও ভেঙ্গে পড়ে, অপরদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার পর জমির উপর প্রজার কোন অধিকার রইল না। জমিদার এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা অধিক মুনাফা লাভের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বা খাজনা আদায় করে কৃষকদেরকে সর্বস্বান্ত করে তোলে।

"এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদারগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, শাসকদের নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া কৃষকদের নিকট হইতে ইচ্ছামত খাজনা আদায় ও জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করিবার অবাধ অধিকার লাভ করে। ইহাতে জমির উপর কৃষকদের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া কৃষকদিগকে চিরদিনের জন্য জমিদারদের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমান স্থির হইল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোষ্ঠি কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায় করে।" [১৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলায় দুর্ভিক্ষের কয়েকটি কারণের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি বিশেষ কারণ। অর্থনীতিবিদরা দেখেছেন, দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের যোগান কম ছিল, তবে তার তুলনায় কম ছিল মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। দিন দিন করে এই

ক্ষমতা কমেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মুদ্রা অর্থনীতি চালু করার ফলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক একটি শোষণ ব্যবস্থা চালু করে শাসকরা কৃষকদের ঐতিহ্যাগত ভূমি-হীন করে দেয়। আগে ছিল লাঙ্গল যার জমি তার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হলো জমির মালিক জমিদার। আর -

"জমিদারেরা তাঁদের জমিদারীর নিরাপত্তা চাইবেন, আর চাইবেন তাদের সেই অধিকারের সংরক্ষণ যার দ্বারা তারা অত্যাধিক করের ও আরো বহু রকম আব ওয়াবের চাপে কৃষককুলের রক্ত শোষণ করতে পারবেন। যে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন তারই বিশ্বস্ত সমর্থক হবেন তাঁরা। শাসকদের জাতীয়ত্ব কি তাতে তাদের কিছুই এসে যায় না।" [১৭]

লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এ ভাবে -

"আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই(এদেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। যে ভূস্বামী একটি লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে শান্তিতে ভোগ করিতে পারে, তাহার মনে উহার কোন রূপ পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগিতেই পারে না।" [১৮]

ফলে বঙ্গীয় জমিদাররাও তাদের প্রভুদের দুর্দিনে সর্বতোভাবে সহযোগীতা করেছে -

"১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় সংগ্রামের আঘাতে যখন ইংরেজ শাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, তখন বঙ্গীয় জমিদার সঙ্ঘের (Bengal Landholder Association) সভাপতি বড়লাটকে এই আশ্বাস দিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন : 'মহামান্য বড়লাট বাহাদুর' আপনি জমিদারগণের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন।" [১৯]

ফলে এদেশে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বরপ্রাপ্ত জমিদারেরা ছিল বড় বাধা। ইংরেজ এবং জমিদারের অবস্থান ছিল একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

"কোম্পানি উহার শাসনের সংকটকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা একটি নিশ্চিত আয়ের বন্দোবস্ত করিল। এই বন্দোবস্তের ফলে জনসাধারণের নগণ্য অংশ (ভূস্বামী ও তালুকদারগণ) কৃষক লুণ্ঠনের যে ভাগ পাইল তাহার পরিবর্তে প্রভু ইংরেজ শাসকগণকে কৃষক জনসাধারণের বিদ্রোহের আঘাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল।" [২০]

মূলত খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল কৃষকদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক মারণকল যার প্রতিক্রিয়া সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না, পড়লেও ততটুকু পড়ে না যত তার পরিনাম। পঞ্চাশের মন্বন্তরের আর একটি কারণ ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপন। কারণ রেলপথ স্থাপনের পরে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। রেলপথ স্থাপনের পূর্বের এবং পরের দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ও প্রাণহানির তুলনা করলে দেখা যায় -

"১৮০২ থেকে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫৩ বৎসরে মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ১৩ এবং সেই সব দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। কিন্তু রেল-পথ স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৬০ থেকে ১৯৭৯ এই ২০ বৎসরে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা হলো ১৬ এবং মৃত্যু সংখ্যা হলো ১ কোটি ২০ লক্ষ।" [২১]

সুপ্রকাশ রায় এর কারণটি ব্যাখ্যা করেছেন -

"ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের ফলে শাসকগণ বৃটেনের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর প্রায় ছয় মাসের খাদ্য এবং সকল বৃটিশ শিল্পের কাঁচা-মালের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতের শস্য বৃটেনে প্রেরণ করিবার বিশেষ সুবিধা লাভ করে। রেলপথের দ্বারা ভারতের বন্দরগুলির সহিত গ্রাম ও শহরের কেন্দ্রসমূহ সংযুক্ত হওয়ায় ভারতের শস্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে জাহাজযোগে ইংলন্ডের বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হইতে থাকে।" [২২]

এ ছাড়া উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেলপথ বসাবার সময় পুরনো সেচ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এসময় রেলপথ বসাবার জন্য বিভিন্ন খাল, জলাশয় এবং নদীর উপর

বাঁধ বসিয়ে রাস্তা করা হয়। শাসক গোষ্ঠির নিকট রেলপথ বসানো তখন গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল, সেচ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। কারণ বণিক শাসকের কাছে খাদ্যশষ্য গ্রাম থেকে শহরে-বন্দরে, তারপর সেখান থেকে সুয়েজ খাল দিয়ে ইংল্যান্ডে পাচার করার জন্য রেলপথ নির্মাণ অতীব জরুরী হয়ে পড়ে।

এ দুর্ভিক্ষের প্রধান একটি কারণ সেচ ব্যবস্থার ধ্বংস -

"ইংরেজেরা এ দেশে আসার পূর্বে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সেচ-ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের অনুরূপ ব্যবস্থার থেকে ছিলো অনেকাংশে উন্নত, সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত। সেজন্যে ঐ সময়ে ভারতীয় কৃষিও ছিলো পরবর্তী যুগের থেকে অনেক বেশী উন্নত। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী সেচ-ব্যবস্থার ব্যাপক অরাজকতার ফলে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ইংরেজদের শাসনামলে জমিদাররা ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার পর থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সেচ-ব্যবস্থা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলে।জমিদাররা নিজের জমি ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে কেবল মাত্র কৃষক শোষণের দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করার চেষ্টায় সমস্ত চিন্তা এবং শক্তিকে নিয়োগ করার ফলে সেচ-ব্যবস্থার মস্ত অবনতি ঘটে। কৃষকদের নিজেদের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর ভেঙ্গে পড়ার ফলে তাদের পক্ষেও সেচ-ব্যবস্থার কোনো উন্নতি সাধন একক ভাবে সম্ভব হয় না। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে একর প্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসে। এর পরিণামে খাদ্যসঙ্কট এবং দুর্ভিক্ষ ভারতীয় কৃষক জীবনে একটা চিরস্থায়ী স্থান দখল করে এ দেশকে পরিণত করে চির দুর্ভিক্ষের দেশে।" [২৩]

অর্থনীতিবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিও ছিল এ দুর্ভিক্ষের উল্লেখযোগ্য কারণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন -

"সরকার পক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিসের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগজি নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন। যাহারা কাজ করে, যুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, কলকারখানা নানাবিধ যুদ্ধ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি নোট অজস্র পরিমানে পাইল, তাহা দিয়া মহাস্ফূর্তিতে জিনিষ পত্র কিনিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ লোকেই ইহার অনেক পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে। ফাঁপানো মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিষপত্র তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। ... ফাঁপানো মুদ্রানীতির জন্য ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ শাসন যন্ত্র দায়ী।" [২৪]

এ ছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল সরকারের বিশেষ অঞ্চলের প্রতি তোষণ নীতি এবং বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল বিশেষ শ্রেণীর প্রতি তোষণ নীতি। তোষণ নীতির কৃপা লাভ করেছে কলকাতা শহর আর উপেক্ষা লাভ করে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা, বর্ধমান সহ সমগ্র বাংলার অনুন্নত অঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল। কলকাতায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে তাদের প্রায় গ্রাম থেকে আসা। সরকার সামরিক সরঞ্জাম এবং যুদ্ধকে সচল রাখার জন্য কলকাতায় এবং সামরিক বিভাগের লোকদের জন্য গ্রাম থেকে সমস্ত খাদ্য এনে কলকাতায় গুদামজাত করে। ফলে গ্রাম হয়ে যায় খাদ্যের বিরল অঞ্চল।

এর পর আসে রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দলের কথা। তাদের কোন্দল পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রকটতার জন্য অনেক দায়ী ছিল। এ সময় বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিল ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ফজলুল হক এ মন্ত্রি সভা গঠন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক, কৃষক প্রজা পার্টি, হিন্দু মহাসভা, তফসিলী হিন্দু ইত্যাদিকে নিয়ে গঠিত এ মন্ত্রিসভা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর হতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিল। আইন সভার বাইরে এ কোয়ালিশনের তেমন কোন প্রস্তাব ছিল না, মূলত এ হক মন্ত্রিসভা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন সমর্থন পায়নি,

বরং সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ফজলুল হকের দুর্ভিক্ষকালীন বড় ট্র্যাজেডি -এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভে ফজলুল হক ব্যর্থ হন। বাধ্য হয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে, হক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায়। এর পর নাজিম উদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এ মন্ত্রিসভায় ৭ জন মুসলমান ও ৬ জন হিন্দু সদস্য ছিলেন, হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ মন্ত্রি-সভায় বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রি নিযুক্ত হন, ফজলুল হকের বহু সংখ্যক সদস্য দ্রুত দলত্যাগ করে এ সময় মুসলিম লীগে যোগদান করে। নাজিমউদ্দিনের মন্ত্রিসভা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তৎপর হয়ে উঠে। সোহরাওয়ার্দী খাদ্য সরবরাহ বিভাগকে জরুরী বিভাগ ঘোষণা করেন। এবং দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক লঙ্গর খানা খোলা হয়। তবে কিছু লঙ্গরখানা ছিল মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। কলকাতা এবং কয়েকটি স্থানে রেশন প্রথা চালু করা হয়। তবু এ অভিযোগ সত্য -

"No steps were taken in India at the beginning of the war to meet any dislocation in production, supply and distribution of food that war might cause so that when imports of rice from Burma stopped due to its occupation by the Japanese and the system of distribution of the domestic suppliers broke down on account of the Denial policy and activities of traders, a tragedy of great magnitude overtook Bengal. In the hour of trial, the country, the people and the administration, both at the Centre and in the Province, were found unprepared to meet the challenge. The result was bewwilderment and chaos which gave

antisocial elements their opportunity to make individual fortunes from human blood and hold their countryman to ransom while a milion and a half poor, helpless and innocent people died a lingering and painful death due to sheer hunger." ২৫

রাজনৈতিক নেতাদের উচিত ছিল এসব সামনে রেখে সমাধানের জন্য তৎপর হওয়া। কিন্তু তা হয়নি। এ ছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় সরকারী শোষণ ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে ছিল তা জানার জন্য নিম্নের তথ্যটিই যথেষ্ট -

"... The central Govermnent had made a profit of R.S. 1 crore on wheat brought from the punjab and sold to Bengal". ২৬

প্রবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এ আচরণ আমাদের স্মরণ করায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে পূর্ণিয়ায় এক সনদ তৈরী হয়, সেখানে দুর্ভিক্ষের বৎসরে রাজস্ব শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রায় উপন্যাসে যে কারণটি এসেছে তা হচ্ছে মজুতদারী। এ মন্বন্তরের প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন, গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, সরকার যে যেখানে পেরেছে শস্য আটকে রেখেছে। কারো মনে ভয়, কারো অতিরিক্ত মুনাফার লোভ, কারো সৈন্যদের জন্য রসদ জমা করা। গৃহস্থ কৃষককে দোষ দেয়া যায় না, কারণ যুদ্ধের ফলে অবস্থা তখন এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে ঘরে খাদ্য জমা রাখাটা তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবু কৃষকের ঘরে যে খুব বেশী খাদ্য জমা ছিল তা নয়। কারণ সরকারের লোক এসে তখন মজুতদারীর অভিযোগে অতিরিক্ত খাদ্য নিয়ে নিতো। তাছাড়া অনেক সহজ সরল কৃষক প্রথম দিকে বুঝতে না পেরে দাম একটু বেশী পেয়ে ফসল বিক্রি করে ফেলে। সে দাম যে আরো অনেক বাড়বে সে ইঙ্গিত তাদের কাছে ছিল না। কারণ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারীদের তালিকায় তারা ছিল না।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"কৃষক, মধ্যবিত্ত-ক্রেতা দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আন্দোলন চলিয়াছে - মিঃ আমেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাজারের সব চেয়ে বড় ক্রেতা সরকার, সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিক ধনিক সম্প্রদায়।"[২৭]

একটি কথা বলা প্রয়োজন দুর্ভিক্ষ প্রথম শুরু হয় মেদিনীপুর জেলায়। তার প্রথম কারণ ছিল প্রাকৃতিক আঘাত। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর রাত্রিবেলা প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত হয় মেদিনীপুর জেলা। শস্য, বৃক্ষ, কুঁড়ে ঘর সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ১৯৪৩ সালের জুলাই এবং আগস্টে বর্ধমান জেলার দামোদর নদীতে বন্যা হয়। এই অঞ্চলগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রকটতায় প্রকৃতির ভূমিকা ছিল। এছাড়া 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনও এ মন্বন্তরের একটি অন্য ধরণের কারণ। ১৭৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকে বাদ দিলে, ১৯৪২ এর আগস্টের এই বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় বিদ্রোহ, অন্য দিকে ব্রিটিশ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সামলাতে হিমসীম খাচ্ছে। বৃটিশের জন্য এই বিদ্রোহ অনেকটা বিপদের উপর বিপদ। এর প্রতিশোধ নেয় শাসকরা একদিকে নব্বই হাজারেরও অধিক বিদ্রোহী গ্রেফতার করে, দশ হাজারের অধিক বিদ্রোহীকে গুলি করে মারে, অন্যদিকে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে তার বৃহৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এর পর সরকারের আর একটি নীতি দুর্ভিক্ষের জন্য বিরাট সহযোগী হয়েছে। 'ডিনায়েল পলিসি' নামক এ নীতি গ্রহণ করে ব্রিটিশ তার শত্রু জাপানী সৈন্যদের খাদ্য এবং পরিবহন সংকটে ফেলার জন্য। ১৯৪২ সালের মে মাসে জাপানী সৈন্যদের আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্রিটিশ সরকার সমুদ্রতীরবর্তী জেলাগুলি থেকে দশ জনের অধিক বহনযোগ্য সকল নৌকা কেড়ে নেয়। সে সাথে শুরু হয় খাদ্যের 'ডিনায়েল পলিসি', বিভিন্ন এলাকা থেকে চাল সরিয়ে ফেলা। এ প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য -

"শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো হইল। ধান সরাইলেইতো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা ঐ সঙ্গে লোপ পায় না। খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল, চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল।" [২৮]

বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বলেন যে, বাংলার গভর্ণর স্যার জন

হাবার্ট মন্ত্রী সভার পরামর্শ না নিয়ে, এমন কি মন্ত্রিসভার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভায় ফজলুল হক বলেন,

> "বর্তমান খাদ্য সংকট পরিস্থিতি আমাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি।' ফজলুল হক আগের সরকার এবং বর্তমান গর্ভণরকে দায়ী করে বলেন, গর্ভণর মন্ত্রি পরিষদের সাথে কোন রকম পরামর্শ না করে অপরিকল্পিত ভাবে জঘন্য 'ডানিয়েল পলিসি' গ্রহণ করে।" [২৯]

সাংবাদিক, গবেষক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুযায়ী এ কারণগুলি আমরা জানলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের পিছে। এবার শাসকদের একজন প্রতিনিধির একটা বক্তব্য শোনা দরকার। যেখানে তাদের চরিত্র প্রকাশ হয়। ভারত সচিব মি. আমেরি পার্লামেন্টের জনৈক সদস্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্বন্তরের কারণ বলেন -

> "কৃষকেরা বাজারে খাদ্য শষ্য ছাড়িতে চাহিতেছে না। আর পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাওয়াতে লোকে বেশী করিয়া খাইতেছে।" [৩০]

বেশী খাইতেছে কথাটাই আপত্তিকর কারণ ভারতের কৃষকদের অবস্থা আমেরিরা আসার পরে অবনতির দিকেই নামিতেছিল। তৎকালীন মানুষদের(ভারতীয়দের) দৈহিক পরিশ্রম বেশী করতে হত বলে একটু বেশী খেতে হত। কিন্তু তা কী তাঁদের প্রতিনিয়ত জোটত ?

> " ১৯৩৬ সালের তদন্তের ফলে ফ্লাউড কমিশন স্বীকার করেন যে, বাঙলায় কৃষকের গড়পড়তায় পরিবার পিছু মাত্র ৪.৮ বিঘা জমি আছে।" [৩১]

লক্ষণীয় ৪.৮ বিঘা হচ্ছে গড়। পরিবার পিছু এই গড় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। খাজনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উৎপাদন খরচ মেটাবার পর এই কৃষকদের অবস্থা বেশী খাওয়া তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় খাবারটাও পাবার কথা নয়। আমেরির এই বক্তব্যকে প্রশ্ন করা যায়, অতি ভোজন কি তারা করেছে, যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরে খেতে না পেয়ে মারা গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে অনাহারে যারা মারা গেলেন, তাদের মধ্যে আমেরির এই বাণী যারা শুনেনি তারা ভাগ্যবান। এই আমেরি প্রশ্নোত্তর কালে আবার বলেছেন -

"He had not heard on any death of European British subject among the victims of the present famine in India".[৩২]

আমেরিকে প্রশ্ন করা যেত, ভারতে কি কোন ইউরোপীয়ান ছিল না যার বেশী খাবার অভ্যাস ছিল। যদি থাকে, তবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সে,অতিভোজীদের পরিণতিতে অর্ন্তভূক্ত হল না কেন? শুধু তাই নয় সম্ভবত অতি ভোজনে অভ্যস্ত উচ্চবিত্ত, মজুতদার, কিংবা কোন ব্রিটিশ সরকারের আমলা অতি ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত করে অনাহারে মরেনি। শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -.

> "মি. আমেরিকে বাংলা গভর্ণমেন্টের সমস্ত ত্রুটির উৎস বলিয়া দায়ী করা চলে, যতদিন সম্ভব, তিনি পার্লামেন্টকে বুঝাইয়াছেন, বাংলার অনাভাব নাই, ... তিনি বাংলার মৃত্যু সংখ্যাও যথা-সম্ভব হ্রাস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।" [৩৩]

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সমস্ত পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, একটা প্রকট মন্বন্তর না হবার মত কোন কারণই হয়তো আর বাকি ছিল না। সমস্ত আয়োজন দেখে ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট হচ্ছিল যে, শিল্পীরা আগেই তার অশনি সংকেতটা দিয়ে দিলেন।

এবার আসা যাক এ মন্বন্তরের পরিণাম নিয়ে! সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো এ মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলো। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য এ মন্বন্তরে মৃত্যুর পরিমানটা এখনো বিতর্কিত। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

> "সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া কমিশন স্থির করিয়াছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলাদেশে ১৫ হইতে ২০ লক্ষ নর-নারী অনাহার জনিত ক্ষয় এবং দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত ব্যাপক রোগে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। মৃত্যু সংখ্যা ইহার অপেক্ষা যে অনেক বেশী ইহার আমার বিশ্বাস। যাহাই হউক ১৫ হইতে ২০ লক্ষ লোক গত ছয় বৎসরে পৃথিবী ব্যাপী যহা সমরে নিহত হয় নাই। সুতরাং ইহা যে কত বড় গুরুতর দুর্ঘটনা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।" [৩৪]

কমিশন সদস্য ডব্লু.আর.অ্যাকরয়েডের মতে - "মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ লক্ষ"।[৩৫]

কালীচরণ ঘোষের মতে "৩৫ থেকে ৪৫ লক্ষ"।[৩৬]

যা হোক মৃত্যুর সংখ্যা যে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক, ইহা অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। সব মৃত্যু যে অনাহারে হয়েছে এমন নয়। বাসস্থান ছেড়ে আসা মানুষের ফুটপাথে, পথেঘাটে আশ্রয় নিলে মশার কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হওয়া , এতোদিন খেতে অভ্যস্থ ছিল না এমন আজে-বাজে অখাদ্য খেয়ে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হয়ে যারা যাওয়া এই সব মৃত্যুরও পরোক্ষ কারণ দুর্ভিক্ষ, তাই শুধু অনাহারে মৃত্যু দিয়েই কেবল দুর্ভিক্ষে মৃত্যু সংখ্যা গ্রহণ যোগ্য নয়। এ অসহায় মানুষগুলির মৃত্যু ছাড়াও মন্বন্তরের পরিনাম স্বরূপ আরো বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি হয়, এ গবেষণা পত্রের অন্য অধ্যায়গুলিতে তার বর্ণনা রয়েছে।"[৩৭]

প্রতি বছর বিশ্বের মানুষ ৬ই আগষ্ট তারিখ 'হিরোশিমা দিবস' পালন করেন। বিশ্বব্যাপী 'যুদ্ধ নয় - শান্তি চাই'এর প্রতীক হিরোশিমা দিবস। মানব ধ্বংসী যুদ্ধ নামক মারণ যজ্ঞের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে মানুষ হিরোশিমা দিবসটি পালন করে স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আনবিক বোমার আঘাতে নিহত "রাষ্ট্র-পুঞ্জের হিসাবে আটাত্তর হাজার"[৩৮] মানুষের উপর মনুষ্য সৃষ্ট আঘাত। "বিস্ফোরণ এবং পরবর্তীতে তেজস্ক্রীয়তার বিষে জর্জরিত হয়ে যারা প্রাণ দিলেন 'জাপান সরকারের পরিসংখ্যানে তার পরিমান দুই লক্ষ ষাট হাজার।"[৩৯] ফ্যাসিবাদের সপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত দেশ জাপানে আনবিক বোমায় নিহত সর্বমোট 'দুই লক্ষ ষাট হাজার' মানুষ। এদের মৃত্যু মানবতার ইতিহাসে একটা বিরাট ক্ষত হয়ে আছে। একই যুদ্ধের পট-ভূমিতে মনুষ্য সৃষ্ট মহামন্বন্তরে একটা পরাধীন দেশের অসহায় দারিদ্রপীড়িত প্রায় পঁয়-ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ মানুষের তৈরী দীর্ঘ মেয়াদী মারণ কলে ধুঁকে ধুঁকে মরল, তা দিয়ে তৈরী হল না মানবতার সপক্ষে কোন প্রতীক। "পঞ্চাশের মন্বন্তর যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক বিস্তৃত কল্পকাহিনী মাত্র।"[৪০] পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্তৃত কল্পকাহিনীর বাইরে কিছু নয়। ফ্যাসিবাদের বিচার হচ্ছে, জেল ও ফাঁসি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা উঠছে। তেমন বিচার হয় ও চাওয়া যেত তেরশ পঞ্চাশের মহামন্বন্তর সৃষ্টিকারী ঠান্ডা মাথার খুনীদের।

এ উপমহাদেশের সে অসহায় মানুষ - যাদের বেশীর ভাগই ছিল অসহায়, অশিক্ষিত, সরল, গরীব চাষী, গরীব গৃহস্থ, স্বল্প বেতনের কারিগর, কম পুঁজির দোকানী, মাঝি-মাল্লা, যারা বুঝে না যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, জিঘাংসা ; তারা জানল না কোন অপরাধে বলি হল তারা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ খুঁজতে গিয়ে যত প্রকার কারণই বেরিয়ে এসেছে তার মূলে আছে যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ, আর এরও মূলে আছে মুনাফাবাদ। পঞ্চাশের মন্বন্তর যে কোন দিক থেকেই তাকানো হোক না কেন, দেখা যায় এ মহামন্বন্তর ছিল মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ লক্ষাধিক মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, আর মানুষের কাছে তা কল্পকাহিনী হয়ে রইল। মন্বন্তর যুগে যুগে কল্পকাহিনী হয় বলেই দুর্ভিক্ষ আজো পৃথিবীর বুকে তার ভয়াবহ চেহারা নিয়ে জায়গায় জায়গায় হানা দেয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে বারটি কারণ আমরা দেখেছি, সে বারটি কারণের কয়েকটি এখনও বিরাজমান আছে। বারটি না থাকার মূলে আর কিছু নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও মঞ্চে নেই আপাতত, ঔপনিবেশিক শাসকও নেই। কিন্তু মঞ্চে না হলেও এক ধরনের নীরব যুদ্ধ এখনো চলছে। আজকের যুগেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের (নিম্ন আয়ের) আয়ের সমপরিমান অর্থ ব্যয় হয় সামরিক এবং সমরাস্ত্র খাতে। তার এক শতাংশ পরিমাণ অর্থ পশু থেকে কিংবা প্রকৃতি থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করে না পৃথিবীর মানুষ। এ ফলাফল প্রমাণ করে মানুষের সব চেয়ে বড় ভয় মানুষকে। অর্ধেক মানুষের আয় যুদ্ধ এবং যুদ্ধবাজ থেকে বাঁচার জন্য ব্যয় করে পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু মুনাফা বাজদের থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীর মানুষ কোন পদক্ষেপ নেয় না। এখনও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মানুষের হত্যা হয় মানুষের দ্বারা। কখন পৃথিবীতে মানুষের শত্রু মানুষই হবে না, মানুষের হত্যাকারী মানুষই হবে না - আমরা তার জন্য দায়ী হচ্ছি শিল্পীদের, সমাজবিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রনায়কদের, অর্থনীতিবিদদের - বিজ্ঞানীদের। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণগুলি যেন আমাদের কাছে ইতিহাস না হয়ে ইতিহাস থেকে একটা শিক্ষা হয়, এমনকি বিশ্বের বর্তমান ঘটমান এবং আগমনেচ্ছু দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় এ শিক্ষা।

----- 0 -----

উল্লেখপঞ্জী :

১। ড· বিনতা রায়চৌধুরী : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য,' সাহিত্যলোক কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ·২।

২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', প্রথম ভাগ। সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ,(চতুর্থ মুদ্রণ,) কলকাতা, ১৯৯৪।

৩। Encyclopedia Britannica, Vol.4. William Benton Publisher, Chicago, 1974, p.46.

৪। অমৃতানন্দ দাস : 'ভারতকোষ'(চতুর্থ খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ·৭৫।

৫। 'এই কারণগুলি উৎকলন করা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ সংকলন 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৪৪, পৃ·৪-৫ থেকে।

৬। অনুরাধা রায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলার শিল্প সাহিত্য', অনুষ্টুপ, বর্ষা ১৩৯৬, কলকাতা, পৃ·১।

৭। তসলিমা নাসরিন : ভূমিকা, 'ফ্যান দাও' (সম্পাদিত - কবিতা সংকলন), পুনশ্চ,কলকাতা, ১৯৯৪।

৮। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলায় মন্বন্তর', এ·মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ·৮১।

৯। Amartya Sen;- 'Poverty and Famine' : An Essay on Entitlement and deprivation, Oxford University Press, Delhi, 1982, Page - 63.

১০। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ·৩।

১১। শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ·১১১।

১২। অনুরাধা রায় : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ·৪৫-৪৬।

১৩। তদেব।

১৪। B.M.Bhatia:Famines in India :1860-1965, 2nd Ed.1967' Bombay, p.309-310.

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: 'বঙ্গদেশের কৃষক', বিবিধ প্রসঙ্গ', বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ.২৯১-২৯২।

১৬। সুপ্রকাশ রায় :'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম; বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা ১৯৯৩ পৃ.১৬।

১৭। মুজফফর আহমদ :'আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি'(প্রথম খন্ড, ১৯২০-১৯২৯), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৬, পৃ.১২২-২৩।

১৮। Radha Kamal Mukherjee: 'Land Problems in India,p.35. উদ্ধৃত, সুপ্রকাশ রায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩৪।

১৯। সুপ্রকাশ রায়: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১৩৫।

২০। তদেব, পৃ.১৩৬।

২১। তদেব, পৃ.১৭৯।

২২। তদেব, পৃ.২।

২৩। বদরুদ্দীন উমর : 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭২, পৃ.৫১।

২৪। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ.৪-৫।

২৫। B.M.Bhatia, ibid, p.309-310.

২৬। Hindustan Standard, New Delhi. Nov.17, 1943.

২৭। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.৬।

২৮। তদেব, পৃ.৭।

২৯। দেশপ্রিয় পার্কে মজলুল হকের জনসভার ভাষণ, উৎকলিত অমৃতবাজার পত্রিকা, ৬ই মে ১৯৪৩।

৩০। 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'দেশ,'কলকাতা, ৭ শ্রাবণ, ১৩৫০।

৩১। ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙালী কোথায় চলেছে' সংস্কৃতি ও সমাজ' -১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-১৩৯০, পৃ.৩৩।

৩২।Mr. Amery as answered a number of questions about India at question time in commons; (Quated from : Amrita Bazar Patrika, Nov.12, 1943.)

৩৩। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ.১১৪।

৩৪। তদেব, পৃ.১২।

৩৫। Ayakroyad. W.R. - 'The Conquest of Famine', London, 1974, p.77.

৩৬। Ghosh, Kalicharan', 'Famine in Bengal' 1770-1943, Calcutta, Indian Associated Publishing Co.Ltd. Calcutta 1944, Page - 137.

৩৭। এ গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায় এবং উপসংহার দ্রষ্টব্য।

৩৮। শ্রীপান্থ: ভূমিকা, 'দায়', (মন্বন্তরের চিত্র সংকলন), পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.১৩।

৩৯। তদেব।

৪০। তদেব।